Department of Bengali
Bish-shataker Chotogolpo
Sem-VI,DSE-3(Hons.)
Dr. Swapna Das

ছোটগল্প

ছোটগল্প কথাসাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা। বাংলা সাহিত্যে এর আবির্ভাব উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ছোটগল্প বলতে সাধারণত তাকেই বোঝায় যা আধঘণ্টা থেকে এক বা দুঘণ্টার মধ্যে এক নাগাড়ে পড়ে শেষ করা যায়। তবে আকারে ছোট হলেই তাকে ছোটগল্প বলা যাবে না। কারণ ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এতে বিন্দুতে সিন্ধুর বিশালতা থাকতে হবে, অর্থাৎ অল্প কথায় অধিক ভাব ব্যক্ত করতে হবে। উপন্যাসের সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য এখানেই। ছোটগল্পে উপন্যাসের বিস্তার থাকে না, থাকে ভাবের ব্যাপকতা। উপন্যাস পড়ে পাঠক পরিতৃপ্তি লাভ করে, কিন্তু ছোটগল্প থেকে পায় কোনো ভাবের ইঙ্গিতমাত্র। ক্ষুদ্র কলেবরে নিগূঢ় সত্যের ব্যঞ্জনায়ই এর সার্থকতা।

ছোটগল্পের প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) তাঁর 'বর্ষাযাপন' কবিতায় বলেছেন:

ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

ছোটগল্পের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো: এর ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে বৃহতের ইঙ্গিত থাকবে, এর আরম্ভ ও উপসংহার হবে নাটকীয়, এর বিষয়বস্তৃত সাধারণত স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্য মেনে চলবে, এতে মানবজীবনের কোনো একটি বিশেষ মুহূর্ত, ভাব বা চরিত্রের একটি বিশেষ দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যেকোনো ধরনের বাহুল্য বর্জনের মাধ্যমে গল্পটি হয়ে উঠবে রসঘন, এতে থাকবে রূপক বা প্রতীকের মাধ্যমে অব্যক্ত কোনো বিষয়ের ইঙ্গিত ইত্যাদি। সর্বোপরি গল্পসমাপ্তির পরেও পাঠকের মনের মধ্যে এর গুঞ্জরণ চলতে থাকবে। তাহলেই তা সার্থক ছোটগল্পে পরিণত হবে।

বাংলা ছোটল্পের প্রথম আভাস পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪) ও রাধারাণী (১৮৭৫) গল্পে। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যয়ের মধুমতী এবং সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-১৮৮৯) রামেশ্বরের অদৃষ্ট, দামিনী প্রভৃতির মধ্যেও ছোটগল্পের আভাস পাওয়া যায়; তবে এর সবগুলিই উপন্যাসধর্মী রচনা। পরে স্বতন্ত্র প্রতিভাস্পর্শে ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯)। তাঁর ভূত ও মানুষ, মুক্তামালা, মজার গল্প ও ডমরুচরিত গল্পগ্রন্থের মধ্যে ছোটগল্পের স্পষ্ট ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়। তবে তাঁর রচনায় উদ্ভট কাহিনীই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি শ্লথগতিতে অবাস্তব সুরে গল্প রচনা করেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২) নবকাহিনী গ্রন্থের কোনো কোনো গল্পেও ছোটগল্প রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ের আর একজন গল্পকার হলেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০)। তিনি প্রেম ও রোম্যান্সের মাধ্যমে ছোটগল্পে বিশিষ্টতা দান করেন।

প্রকৃত অর্থে বাংলা সাহিত্যে সার্থক ছোটগল্পকার হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর প্রথম গল্প 'ভিখারিণী' ১৮৭৪ সালে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও 'দেনা-পাওনা' (১৮৯০) গল্পটিই প্রথম সার্থক ছোটগল্প। ১৮৮৪-৮৫ সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা' ও 'মুকুট'। গল্পগুচ্ছ, সেতিনসঙ্গী প্রভৃতি গ্রন্থে , রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সংখ্যা ১১৯টি।

ত্রিশ বছর বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচনা শুরু করেন। ছোটগল্প রচনার সঙ্গে তাঁর জমিদারি তদারকির একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ উপলক্ষে কুষ্টিয়া, শিলাইদহ, পাবনা, রাজশাহী, পতিসর, শাহজাদপুর প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরতে গিয়ে তিনি নিবিড়ভাবে পরিচিত হন পদ্মা, গড়াই, নাগর ও ইছামতী নদী এবং গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে। ফলে তাঁর প্রথমদিকের লেখায় এসব বিষয় উপজীব্য হয়েছে। ইমপ্রেসনিস্ট শিল্পীদের মতো জীবনের রং ও রূপ কাছ থেকে উপভোগ করে তিনি তাঁর গল্পে স্থান দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথই যথার্থ অর্থে বাংলা ছোটগল্পে জীবন দান করেন।

বিষয়বস্তুত হিসেবে রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রেম, প্রকৃতি, মানুষ, অতিপ্রাকৃত ঘটনা, সামাজিক জীবন, নারী-পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক দিক ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। প্রেমের গল্প হিসেবে একরাত্রি, মহামায়া, সমাপ্তি, মাল্যদান, মধ্যবর্তিনী, শাস্তি, প্রায়শ্চিত্ত, দুরাশা, অধ্যাপক, নষ্টনীড়, স্ত্রীর পত্র, পাত্র ও পাত্রী, মানভঞ্জন, রবিবার, শেষকথা, ল্যাবরেটরি প্রভৃতি গল্পের নাম উল্লেখ করা যায়। প্রকৃতিবিষয়ক গল্পের মধ্যে শুভা, অতিথি, আপদ, বলাই ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব গল্পে প্রকৃতিপ্রেমিক নারী ও বালক চরিত্রগুলি হয়েছে যেন প্রকৃতির সন্তান। সমাজজীবনের সম্পর্কবৈচিত্র্য নিয়ে রচিত গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ব্যবধান, মেঘ ও রৌদ্র, পণরক্ষা, পোস্টমাস্টার, কাবুলিওয়ালা, দিদি, হৈমন্তী, কর্মফল, দান-প্রতিদান, দেনা-পাওনা, ছুটি, পুত্রযজ্ঞ, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি। অতিপ্রাকৃত রসের স্পর্শ লেগেছে গুপ্তধন, জীবিত ও মৃত, নিশীথে, মণিহারা, ক্ষুধিত পাষাণ, মাস্টারমশাই

ইত্যাদি গল্পে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম সার্থকভাবে বাংলা ছোটগল্পকে বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ছোটগল্পকারদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৬৩-১৯৪৯) নাম। বাংলা ব্যঙ্গগল্পের ধারায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার। তাঁর বিশিষ্ট গল্পগুলি হলো: আমরা কি ও কে, কবুলতি, পাথেয়, দুঃখের দেওয়ালী, মা ফলেষু, সন্ধ্যা শঙ্খ ও নমস্কারী। এর পরের ছোটগল্পকার হলেন প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। তিনি ছোটগল্প রচনায় অনেকটা দক্ষতা দেখালেও রূপসংহতির অভাবে তাঁর কোনো গল্পই পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্প হয়ে ওঠেনি। তাঁর গল্পগ্রন্থের মধ্যে চার-ইয়ারি কথা, আহুতি, নীললোহিত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) ১৯০০-১৯৩১ সাল পর্যন্ত ত্রিশ বছর ধরে শতাধিক ছোটগল্প রচনা করেন। নবকথা, ষোড়শী, গল্পাঞ্জলি, গল্পবীথি, পত্রপুষ্প, গহনার বাক্স, বিলাসিনী, যুবকের প্রেম, নতুন বই, জামাতা বাবাজী ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প। তাঁর গল্পে সাধারণ বাঙালিজীবনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেলেও তাঁর কৌতুকরসাশ্রিত গল্পগুলিই বেশি উপভোগ্য।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) আবির্ভাব বাংলা ছোটগল্পে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'মন্দির' তাঁকে এ ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য এনে দেয়। এ ছাড়া কাশীনাথ, একাদশী বৈরাগী, মামলার ফল, পরেশ, বিলাসী, মুষ্টিমেয়, অভাগীর স্বর্গ, মহেশ ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প। এসব গল্পে বঞ্চিতদের বেদনার কাহিনী জীবনসন্ধানী শিল্পী হিসেবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভের ফলে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) সূক্ষ্ম জীবনদৃষ্টি নিয়ে ছোটগল্প লিখেছেন। পুষ্পপাত্র, সওগাত, গল্পপত্র, ধূপছায়া, চাঁদমালা, বরণডালা, মণিমঞ্জরী ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯) ঝাঁপি, পাপড়ি, জলছবি, খেয়ালের খেসারৎ ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা গল্পে অমানবিক জীবনবাসনা ও মনোলৌল্যের লেখক হচ্ছেন জগদীশ গুপ্ত। তাঁর গল্পগ্রন্থসমূহ বিনোদিনী, পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক, শ্রীমতী ইত্যাদি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) রচিত ছোটগল্পগুলি কল্পনাপ্রবণতা ও অনুভূতির গাঢ়তায় চমৎকার। তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে মেঘমল্লার, মৌরীফুল, যাত্রীবদল, জন্ম ও মৃত্যু, কিন্নরদল, বেনীগির ফুলবাড়ি, বিধু মাস্টার, অসাধারণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতিকে উপজীব্য করে বেশিরভাগ গল্প রচনা করেছেন। পাষাণপুরী, নীলকণ্ঠ, ছলনাময়ী, জলসাগর, রসকলি, তিনশূন্য ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। তাঁর গল্পে বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাকহরকরা ইত্যাদি সাধারণ শ্রেণীর মানুষের জীবনচিত্র দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে প্রধানত যৌবনের জয়গান

গেয়েছেন। তাঁর প্রথম গল্পসংকলন ব্যথার দান-এ (১৯২২) গদ্যকাব্যের আভাস যাওয়া যায়। নজরুলের গল্পের একটি চমৎকার সংকলন হচ্ছে শিউলিমালা (১৯৩১)। এ গ্রন্থে তিনি হাস্যরস সৃষ্টিতে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। রিক্তের বেদন (১৯২৫তাঁর (অপর একটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ। তাঁর অধিকাংশ গল্পেই নর-নারীর প্রেম প্রাধান্য পেয়েছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৭৬) খনি শ্রমিকদের নিয়ে গল্প রচনার পথিকৃৎ হিসেবে খ্যাত। তাঁর প্রতিভার নিদর্শনস্বরূপ অতসী, বধূবরণ, মারণযন্ত্র, নারীমেধ, দিনমজুর ইত্যাদি গল্পগ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যায়। বাংলা ছোটগল্পে তিনিই প্রথম আঞ্চলিকতা প্রয়োগ করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৫-১৯৫৬) কল্লোলগোষ্ঠীর বাস্তবধর্মিতার আদর্শ নিয়ে ছোটগল্পে আবির্ভূত হন। তিনি সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক জীবনদৃষ্টির মাধ্যমে গল্পে জীবনের আন্তর সত্যকে খুঁজেছেন। মানবজীবনের জৈবিক চাহিদা বলে খ্যাত ফ্রয়েডীয় চেতনা তাঁর গল্পে বারবার উঁকি দিয়েছে। তাঁর 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭) গল্পটি নৃশংসতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার জোরালো অভিব্যক্তি। তাঁর 'সরীসৃপ' (১৯৩৯) গল্পটি একজন পুরুষের মনোলোকের সরীসৃপ-লীলাকে অবলম্বন করে রচিত। এ ছাড়া তাঁর গল্পগ্রন্থসমূহের মধ্যে অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮), সরীসৃপ (১৯৩৯), বৌ (১৯৪৩), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), ভেজাল (১৯৪৪), হলুদ পোড়া (১৯৪৫), আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬), মাটির মাশুল (১৯৪৮), ছোট বড় (১৯৪৮), ফেরিওয়ালা (১৯৫৩), শ্রেষ্ঠগল্প (১৯৫০) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রবোধকুমার সান্যালের (১৯০৫-১৯৮৩) গল্প লেখার রীতি সহজ-সরল ও হৃদয়গ্রাহী। চেনা ও জানা, নিশিপদ্ম, অবিকল, অঙ্গরাগ, কয়েক ঘণ্টা মাত্র, দিবাচল, গল্পসঞ্চয়ন, নওরঙ্গী, মধুকরী, মাস, নীচের তলায়, অঙ্গার, কাদামাটির দুর্গ, সায়াহ্ন, পঞ্চতীর ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ।

বিভাগপূর্বকালে ছোটগল্প রচনায় খ্যাতি লাভ করেছিলেন এমন আরো কয়েকজন লেখক হলেন: দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, রাজশেখর বসু, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ।

বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত রচিত ছোটগল্পগুলিকে বিষয়বস্ত্তর দিক থেকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন:

প্রেমের গল্প এ ধরনের গল্পে মানব-মানবীর বিচিত্র প্রেমানুভূতির রূপায়ণ ঘটে। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী, রবীন্দ্রনাথের একরাত্রি, নষ্টনীড়, সমাপ্তি, স্ত্রীর পত্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সামাজিক গল্প এ ধরনের গল্পে কোনো বিশেষ সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের পয়লা নম্বর, পোস্টমাস্টার ;হালদার গোষ্ঠী ,মেঘ ও রৌদ্র ,

;অভাগীর স্বর্গ ,বিন্দুর ছেলে ,শরৎচন্দ্রের মহেশ ;কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের থাকো তারাশঙ্করের পিতাপুত্র ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক গল্প অতীত ইতিহাসের উপকরণ নিয়ে রচিত গল্প, যেমন রবীন্দ্রনাথের দালিয়া, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্নতত্ত্ব, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃৎপ্রদীপ, চন্দনমূর্তি ইত্যাদি।

প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কিত গল্প এ শ্রেণীর গল্পে প্রকৃতির পটভূমিকায় চরিত্রাঙ্কন করা হয়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সুভা, তারাপদ, অতিথি উল্লেখযোগ্য।

রূপক বা সাঙ্কেতিক গল্প এ শ্রেণীর গল্পে কোনো রূপক বা প্রতীকের আড়ালে সর্বজনীন সত্যের প্রকাশ ঘটে। একে প্রতীকধর্মী গল্পও বলা হয়। রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ, গুপ্তধন এ শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য গল্প।

অতিপ্রাকৃত গল্প অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ঘটনা অবলম্বন করে এ ধরনের গল্প রচিত হয়। এ শ্রেণীর গল্প পড়লে পাঠকের মনে এক ধরনের শিহরণ বা ভয়ের উদ্রেক হয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে, সম্পত্তি সমর্পণ এ শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য গল্প।

ব্যঙ্গ বা হাস্যরসাত্মক গল্প আখ্যানভাগ বা চরিত্রচিত্রণ অপেক্ষা হাস্যরসই এ শ্রেণীর গল্পে প্রাধান্য লাভ করে। যেমন রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপক, রাজটিকা; প্রভাতকুমারের রসময়ীর রসিকতা, মাস্টার-মশাই, বলবান জামাতা; কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি ইত্যাদি।

মনস্তাত্ত্বিক গল্প এ ধরনের গল্পে পাত্র-পাত্রীর মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক বিষয় প্রধান হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার, শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি ইত্যাদি এ শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য গল্প।

গার্হস্থ্যবিষয়ক গল্প পারিবারিক কাহিনী অবলম্বন করে এ ধরনের লেখা হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের ব্যবধান, মধবর্তিনী ইত্যাদি।

বিজ্ঞানবিষয়ক গল্প বিজ্ঞানবিষয়ক কাহিনী নিয়ে রচিত গল্প। যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের শয়তানের দ্বীপ, সুবোধ ঘোষের সুন্দরং ইত্যাদি।

উদ্ভট গল্প এ ধরনের গল্পে কাল্পনিক বা অবাস্তব কাহিনী বাস্তবতা-অতিক্রান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগবতীর পলায়ন, পঞ্জিকা-পঞ্চায়েৎ, পূজার প্রসাদ, আমাদের সানডে সভা, মুক্তি, জাগৃহি ইত্যাদি এ ধরনের উল্লেখযোগ্য গল্প।

মনুষ্যেতর প্রাণিবিষয়ক গল্প প্রাণিজগতের আচার-আচরণ ও বৈচিত্র্য নিয়ে এ ধরনের গল্প লেখা হয়। যেমন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আদরিণী, তারাশঙ্করের নারী ও নাগিনী, বিভূতিভূষণের বুধির বাড়ী ফেরা ইত্যাদি।

বস্ত্তনিষ্ঠ গল্প এ ধরনের গল্পে মানবজীবনের কোনো অধ্যায় বা কাহিনী বাস্তবসম্মতভাবে প্রকাশ পায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নমুনা, প্রাগৈতিহাসিক এ শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য গল্প।

বিদেশি পটভূমিকায় রচিত গল্প ভিনদেশী নর-নারীর চরিত্র অবলম্বন করে এ ধরনে গল্প রচিত হয়, যেমন প্রভাতকুমারের মাতৃহীন। [মোঃ মাসুদ পারভেজ]

১৯৪৭ সালে দেশভাগের কারণে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশের সাহিত্যে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, অল্পকালের মধ্যেই এ দেশিয় লেখকদের সৃষ্টিশীল রচনায় তা পূর্ণ হয়ে ওঠে। সাহিত্যের অপরাপর শাখার মতো ছোটগল্পের শাখাটিও ক্রমাগত ঋদ্ধতর হয়।

ছোটগল্পকার জগদীশ গুপ্ত

বিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে যে বিস্ময়কর আধুনিকতার সূচনা, তার বড় কৃতিত্ব কল্লোল পত্রিকার (প্রতিষ্ঠা ১৯২৩, কলকাতা)। পরে উত্তরা, প্রগতি, কালিকলম, পূর্বাশা অনেক পত্রিকাই কল্লোলের অনুসরণে আধুনিক সাহিত্য সৃজনের পৃষ্ঠপোষক হয়। সাহিত্যের এই নবতর উদ্বোধন কল্লোল যুগ নামে পরিচিত। বিশ ও ত্রিশের দশকের প্রতিভাধর কবি ও কথাসাহিত্যিকদের আবির্ভাব এই সাহিত্য আন্দোলনেরই ফসল। এ যুগের সূচনাকালে বাংলা সাহিত্য ছিল রবীন্দ্র প্রভাবে পরিকীর্ণ। একদল সৃষ্টিশীল তরুণ পাশ্চাত্য আধুনিকতায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং রবীন্দ্র-ধারার বাইরে গিয়ে একটি স্বতন্ত্র ও মৃত্তিকা সংলগ্ন সাহিত্যরূপ দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। তাঁরা কেবল উচ্চতর জীবনের গল্পই শোনান নি, শুনিয়েছেন জীবনের ক্লেদ-গ্লানি, লোভ, অসহায়ত্ব, জিঘাংসা এবং রুখে দাঁড়ানোর কথা। ফ্রয়েড এবং মার্ক্সের দর্শন তাঁদের প্রভাবিত করেছিল দারুণভাবে। চেয়েছিলেন। তাঁরা কেবল উচ্চতর জীবনের গল্পই শোনান নি, শুনিয়েছেন জীবনের ক্লেদ-গ্লানি, লোভ, অসহায়ত্ব, জিঘাংসা এবং রুখে দাঁড়ানোর কথা। ফ্রয়েড এবং মার্ক্সের দর্শন তাঁদের প্রভাবিত করেছিল দারুণভাবে।

কল্লোল যুগের প্রায় অপরিচিত কিন্তু অনন্য কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬ - ১৯৫৭)। তিনি কল্লোল কালের হলেও কখনোই কল্লোলীয় সাহিত্য আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত হন নি। এমনকি কখনো কল্লোলের অফিসেও যান নি, কেবল তাঁর লেখা পাঠিয়েছেন। কয়েকজন প্রকাশক ছাড়া অন্যদের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল না। প্রচারের বাইরে থেকে নিভৃতে, নির্জনে সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। কিন্তু এমনই অভিনবত্ব তিনি নিয়ে এসেছিলেন যে, সমকাল এবং

উত্তরকাল কেউই তাঁকে সাদরে গ্রহণ করতে পারে নি। কেবল বোদ্ধা সাহিত্যিক মহলে তাঁর অটুট গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তিনি আধুনিক কথাসাহিত্যের নির্মাতা বা প্রথম আধুনিক গল্পকার। রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের সাহিত্য বলয়ের বাইরে গিয়ে তিনি অদৃষ্টপূর্ব এক সাহিত্য জগত নির্মাণ করেছেন। মোটামুটিভাবে ১৯২৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তাঁর কথকতার কাল। সাহিত্য সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

> *জগদীশ গুপ্ত কল্লোলের কালবর্তী এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে কল্লোলের যা মূল বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত ছিল তা একমাত্র জগদীশ গুপ্তের রচনাতেই অভিব্যক্ত।*

জগদীশ গুপ্তের পরিবারের আদিনিবাস বর্তমান বাংলাদেশের রাজবাড়ি জেলায়। পিতা কৈলাশচন্দ্র গুপ্ত, মাতা সৌদামিনী দেবী এবং স্ত্রী চারুবালা গুপ্তা। পিতার কার্যোপলক্ষে তাঁরা কুষ্টিয়ায় বাস করতেন। কৈলাশ গুপ্ত ছিলেন কুষ্টিয়া আদালতের নামকরা আইনজীবী এবং বিখ্যাত ঠাকুর এস্টেটের আইন উপদেষ্টা। তাঁদের আত্মীয়কুলে অনেকেই আইনজীবী ছিলেন। জগদীশ গুপ্তের পরিবারের সাথে কয়েকজন সাহিত্যিকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁর মা সৌদামিনী দেবী নিবিষ্ট সাহিত্য পাঠক ছিলেন। বঙ্কিম, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রমেশচন্দ্রের রচনার সাথে তাঁর পরিচয় ছিল, যা জগদীশ গুপ্তকে সাহিত্যিক হয়ে উঠতে প্রাণিত করেছিল।

জগদীশ গুপ্তের শৈশব অভিজ্ঞতা অনেক বিচিত্র। তাঁদের কুষ্টিয়ার বাড়ির প্রতিবেশে অনেক গণিকার বাড়ি ছিল, যাঁরা বিভিন্ন বাড়িতে ঝিয়ের কাজ, আতুর পাহারার কাজ করতেন এবং ঘর ভাড়া করে থাকতেন। তাঁদের সাথে গুপ্ত পরিবারের সম্পর্ক ছিল আত্মীয় বা প্রতিবেশীর মতই ঘনিষ্ঠ। জগদীশ গুপ্তকে তাঁরা ছেলেবেলায় দেখাশোনাও করতেন। তাঁর মা কখনো এই মহিলাদের ঘৃণার পাত্র হিসেবে দেখেন নি বরং অনেকের সাথেই আন্তরিক সম্পর্ক রেখেছিলেন। জগদীশ গুপ্তের অনেক গল্প উপন্যাসে গণিকা চরিত্র এসেছে। চৌদ্দ-পনের বছর বয়সে তিনি একবার কুষ্টিয়ার গড়াই নদীতে সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে যাচ্ছিলেন। তাঁর সতীর্থ সতীনাথ কর্মকার তাঁকে বাঁচিয়ে আনেন। তাঁর স্ত্রী চারুবালা গুপ্তা অনুমান করেন, এ ঘটনা তাঁর দিবসের শেষে গল্পের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকতে পারে।

জগদীশ গুপ্ত কুষ্টিয়া হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু এখানে তিনি পড়া শেষ করতে পারেন নি। কারণ, তিনি পাঠ্যপুস্তকের আড়ালে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়তেন এবং ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতার অনুকরণে নারীপ্রেমে কাতর কবিতা লিখতেন, যা বড়রা পছন্দ করতে পারেন নি। তাঁকে কলকাতায় পাঠানো হয়। সেখানে তিনি এন্ট্রান্স পাশ করে রিপন কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু এখানেও তিনি লেখাপড়া শেষ করেন নি। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল তিনি আইন বিষয়ে পড়া শেষ করে ওকালতি করবেন। এতবড় পরিবারের সন্তান হয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি

টাইপিস্ট হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর পেশাকে সামান্য বিবেচনা করে তাঁর পরিবার লোকলজ্জা ও মর্যাদার ভয়ে তাঁকে কুষ্টিয়ায় চাকরি করতে দেন নি। তিনি কিছুকাল ফাউন্টেন পেনের কালি তৈরির ব্যবসা করেছিলেন, নাম ছিল Jago's Ink, কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি ব্যর্থ হন। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, সাহিত্যে আত্মনিবেদনের জন্যই তাঁর জীবনের এই উচ্চাভিলাষহীনতা।

তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে স্ত্রী চারুবালা গুপ্তা স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন,

মানুষ হিসেবে উনি ছিলেন অত্যন্ত চাপা, অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ, আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রচণ্ড তীব্র। অত্যন্ত কম কথা বলতেন। তবে হঠাৎ করে এমন একটা কড়া কথা অথবা এমন একটা রসিকতা করতেন যেটা আমাদের কাছে কিছুটা আশ্চর্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।

ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি বেশ উদাসীন ছিলেন। স্ত্রীর বর্ণনায়,

কোন রকম সংস্কার ওঁর মধ্যে দেখিনি। এমনকি ঠাকুর দেবতার সম্পর্কেও ওঁর কোন বাড়াবাড়ি দেখি নি।

তাঁর গল্প-উপন্যাসে দেবতাদের কটাক্ষ করা উক্তি এবং ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের অর্থলিপ্সার বর্ণনা থেকে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। খুব সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ ছিলেন তিনি। বেহালা, বাঁশি নানা বাদ্যযন্ত্র বাজানোয় দক্ষ ছিলেন।

জগদীশ গুপ্ত তাঁর সাহিত্যে মানব মনের অন্ধকার দিককে বেশি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। আটপৌরে মানুষের অন্তরও যে কতটা কলুষতায় ভর্তি বাংলা সাহিত্যে প্রথম তিনিই তা উদঘাটন করেছেন। লোভ, হিংসা, হিংস্রতা, আগ্রাসী যৌনতা, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, নিয়তির করাল গ্রাস, নিষ্ঠুরতা তাঁর গল্পে প্রবল, যদিও অল্পসংখ্যক হাস্য কৌতুকের গল্পও তিনি লিখেছেন। তাঁর সৃষ্ট পুরুষ চরিত্রগুলোতে অপরাধপ্রবণতা বেশি। তাঁর গল্পের চরিত্ররা মানবিক বোধে উজ্জীবিত নয়। তারা একান্তই জৈবিক মানুষ। তাঁর মতে,

মানুষ মাত্রেই মনে মনে স্বভাবতই অধার্মিক এবং মানুষ মাত্রেরই স্নায়ুরোগ ভিতরে থাকেই।

তাঁর গল্পে মানবিক নায়ক নেই, অমানবিক খলনায়কই গল্পের প্রধান চরিত্র। এই খলনায়ক-নায়িকারা কখনো অসাধুতার সুফল ভোগ করেছে, কখনো নিষ্ঠুর নিয়তির শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই তিনি হয়ে ওঠেন দুঃখ ও হতাশার কথক। তবু এসব গল্প আধুনিকতায় অনন্য।

তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *বিনোদিনী* (১৯২৭) বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক গল্পগ্রন্থ। বইটির প্রথম গল্প *দিবসের শেষে*। গল্পটি সম্পর্কে এককথায় বলতে গেলে বলতে হবে ভয়ংকর। বাংলা সাহিত্যে এমন তীব্র নিষ্ঠুর নিয়তিবাদী গল্প আর নেই। রতি নাপিত ও স্ত্রী নারাণীর একমাত্র সন্তান পাঁচু, যার বয়স পাঁচ। নারাণি ইতোপূর্বে তিনটি মৃত পুত্র প্রসব করেছিল। তাই নানারকম তাবিজ কবচ পাঁচুর নিরাপত্তায় নিযুক্ত। এই পাঁচু এক সকালে আকস্মিকভাবে বলে বসে, *'মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে'*। পাঁচু নানারকম অদ্ভুত কথা বলে, এই যুক্তিতেও মা স্থির থাকতে পারলেন না। তাদের বাড়ির পাশেই কামদা নদী, কিন্তু তাতে কুমিরের উপস্থিতির কথা কেউ কখনো শোনে নি। রতি নাপিত স্নানের সময় নানাভাবে ছেলেকে আশ্বস্ত করে; কিন্তু নদীর কাছে গিয়ে তার মনে হয়, *'নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ আবিল জলরাশি যেন ভয়ংকর নিঃশব্দে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে শাণিত অস্ত্রের মত ঝকঝক করিতেছে'*। বিকেলে পাঁচু চুরি করে কাঁঠাল খেলে রতি আবারও তাকে হাত মুখ ধোয়াতে নদীর কাছে নিয়ে যায়। হাতমুখ ধোয়ার পর ফিরে আসার সময় নদীর পাড়ে ভুলে ঘটি ফেলে আসে পাঁচু। ফিরে গিয়ে ঘটি আনতে গেল। *'এমন সময় তাহারই একান্ত সন্নিকটে দুটি সুবৃহৎ চক্ষু নিঃশব্দে জলের উপর ভাসিয়া উঠিল; পরমুহূর্তেই সে-স্থানের জল আলোড়িত হইয়া উঠিল, লেজটা একবার চমক দিয়া বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া গেল'*। বারবার কুমিরের ভয় কাটানোর পরও নিষ্ঠুর নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় পাঁচুর।

পুরাতন ভৃত্য গল্পটি বিশ্বাসভাজনের বিশ্বাসহন্তার গল্প। রবীন্দ্রনাথের *পুরাতন ভৃত্য* কবিতায় আমরা দেখি ভৃত্যের বিশ্বাস রক্ষার মানবিক উদাহরণ। জগদীশ গুপ্তের গল্পে ঠিক তার উল্টো। বিশ্বেশ্বর ব্রাহ্মণ একদিন মাঠের ধারে এক অপরিচিত যুবককে জ্বরের ঘোরে পড়ে থাকতে দেখে লোকজনের সাহায্যে বাড়িতে নিয়ে যায়। সে এবং তার স্ত্রী ক্ষেমঙ্করীর সেবাযত্নে সুস্থ হয় যুবক। ক্ষেমঙ্করীকে যুবক মাতৃজ্ঞান করে। বাৎসল্য রসে সিক্ত হয়ে ক্ষেমঙ্করী তাকে নাম দেন নব। পরবর্তী পাঁচ বছর নব নিষ্ঠার সাথে ব্রাহ্মণ পরিবারের সেবা যত্ন করে। ক্ষেমঙ্করীর মৃত্যু হলে *'গ্রামের লোক বিশ্বেশ্বরকে শান্ত করিল, কিন্তু নবকে শান্ত করাই দুরূহ হইয়া পড়িল'*। শ্রাদ্ধের অর্থ যোগাতে বিশ্বেশ্বর তার শিষ্যদের বাড়িতে অর্থ সংগ্রহে যায়। নব অবাক হয়ে লক্ষ্য করে কেবল পদধূলি আর আশীর্বাদ দিয়েই ব্রাহ্মণ সাতশ টাকা সংগ্রহ করে ফেলেছে। ফিরে আসার পথে অন্ধকার মাঠে বিশ্বশ্বরকে ঘায়েল করে টাকা নিয়ে পালায় নব। গল্পটিতে কাহিনীর চমকের পাশাপাশি গ্রামীণ জীবন, হিন্দু সমাজের জাত-পাতের ভেদ, মানুষের বদলে যাওয়া সবই শিল্পাকারে চিত্রিত।

প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী গল্পটি অদ্ভুত। গল্পের প্রধান চরিত্র প্রভাবশালী ব্যক্তি সদু খাঁ। তার বিশ কুঠুরির দোতলা দালানে থাকে পাঁচ বিবি, দাসী বাঁদী খানসামা পরিচারকবৃন্দ। *'দাসী বাঁদী বিবি-সকলের গর্ভেই ছেলেমেয়ে জন্মগ্রহণ করিতেছে'*। একবার ব্যবসার জন্য এক গ্রামে গিয়ে সেখানকার জসীমের বৌকে তার পছন্দ হয়। জসীমের পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে সদু। নিজের ভাইয়ের বিয়ের

কথা বলে জসীমের বৌকে নিজের বাড়িতে এনে রাখে। কিছুদিন পরে জসীম দেখা করতে গেলে তাকে তাড়িয়ে দেয় সদু। অর্জুন নমশূদ্রের সহায়তায় সদু খাঁর লাঠিয়াল বাহিনীকে পরাজিত করলে গ্রামীণ নিয়ম অনুযায়ী নিজের বৌকে ফেরত পাওয়ার কথা জসীমের। কিন্তু শেষ দুটি লাইনে জগদীশ গুপ্ত চমকে দেন আমাদের। *'জসীম তার বৌকে ফিরিয়া পায় নাই। বৌ নিজেই আসিতে চায় নাই'*। নারীর রহস্যময়তার এ কোন নতুন দিকের কথা জানাতে চেয়েছেন গল্পকার?

চন্দ্র-সূর্য যতদিন গল্পে আমরা দেখি সম্পত্তি ভাগ না হওয়ার জন্য দুবোনকে একই স্বামীর কাছে বিয়ে দেওয়া হয়। এতে বড় বৌ ক্ষণপ্রভা উনিশ বছরে বয়সেই ভাবতে থাকে সে বুড়ি হয়ে গেছে, তাই তার রূপের আর গ্রহণযোগ্যতা নেই। কিন্তু সে পুত্রসন্তানের মা। এই সম্বলটি দিয়ে সে স্বামীর মন আকর্ষণের চেষ্টা করে। কিন্তু নিজের উপযোগিতা নিঃশেষিত হয়েছে এই বিবেচনায় এবং নারীত্বের অপমানে শেষ পর্যন্ত মানসিক ভারসাম্য হারায় ক্ষণপ্রভা।

মানুষের শক্তিশালী প্রবণতা হিসেবে যৌনতাকে আমরা আবিষ্কার করি *আদি কথার একটি* গল্পে। কাঞ্চন যৌবনে বিধবা হয়। তাকে শারীরিকভাবে পেতে চাইত প্রতিবেশী সুবল। অন্য উপায় না পেয়ে কাঞ্চনের কাছে যাওয়ার জন্য তার পাঁচ বছরের মেয়ে খুশিকে বিয়ে করে সে। একসময় প্রকাশ করে তার সুপ্ত বাসনা। শুরুতে প্রবল বাধা দিলেও ধীরে ধীরে যেন কাঞ্চনের বাধা দেওয়ার শক্তি হ্রাস পায়। সুবল প্রবল পাশবিকতার সাথে বিকৃত লোভ চরিতার্থ করে। সমাজের কাঠগড়ায় মূল অপরাধী হয় কাঞ্চন আর সুবলকে লঘুদণ্ড দিয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

স্বামীর মৃত্যুর পর *বিধবা রতিমঞ্জরী* পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয় *'বিবাহার্থিনী বিধবা'* শিরোনামে। এগারো বছরের দাম্পত্য জীবন যাপনের পর তার ধারণা হয় তার স্বামী তাকে বিয়ে করেছে সুলভে গণিকা পাওয়ার লোভে। বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে এক ব্যক্তি তার সাথে দেখা করতে আসে। লোকটির সাথে কথা বলে রতিমঞ্জরীর স্পষ্ট বিশ্বাস জন্মে, বৈবাহিক সম্পর্কে পুরুষেরা দেহাতীত কোন প্রেম আকাঙ্খা করে না। তাদের চাই নারীর রক্তমাংসের শরীর। জগদীশ গুপ্ত রতিমঞ্জরীর পরিণতি ব্যাখ্যা করেন, *'তার গণিকাবৃত্তিই পৃথিবী চায়- গণিকাই সে হবে'*।

অর্থলোভে মানুষের নৈতিক পতনের অকল্পনীয় চিত্র পাই *পয়োমুখম* গল্পে। কৃষ্ণকান্ত কবিরাজ বৈবাহিক মহলে নানা কথা প্রচার করে নিজের অযোগ্য পুত্রকে বিয়ের বাজারে দুর্মূল্য করে তোলে। তারপর উচ্চ পণে একের পর এক বিয়ে করায় এবং পুত্রবধূদের বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। পরে পুত্র ভূতনাথ বাবার সত্য উদ্ঘাটন করে, ফলে তার তৃতীয় স্ত্রী অকালমৃত্যু থেকে রক্ষা পায়।

সাধারণভাবে জগদীশ গুপ্ত প্রথম কয়েক অনুচ্ছেদে গল্পের আবহটি তৈরি করেন এবং তারপর থেকে মূল ঘটনা শুরু হয়। তবে তিনি অনেক বাক্য বা

অনুচ্ছেদের পরে উদ্দেশ্যহীন ড্যাশ ব্যবহার করেছেন, যা পরবর্তী বাক্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। যেখানে চিন্তার অবকাশ আছে, সেখানে . . . (ডট চিহ্ন) দিয়েছেন। শুরুর দিকের গল্পগুলো সাধুভাষায় লিখলেও পরে চলিতভাষায় লিখতে শুরু করেন।

সাহিত্য গবেষক সরকার আবদুল মান্নানের এম.ফিল. গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল জগদীশ গুপ্তের সাহিত্য। তাঁর গবেষণাপত্রের গ্রন্থরূপ বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত *জগদীশ গুপ্তের রচনা ও জগৎ* (২০০১)। এখানে তিনি জগদীশ গুপ্তের গল্পকে চারভাগে ভাগ করেন।

ক. যৌন জটিলতা ও যৌন অপরাধমূলক গল্প – এ ধারার গল্পঃ চন্দ্র-সূর্য যতদিন, আদি কথার একটি, প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী, বিধবা রতিমঞ্জরী, কলঙ্কিত সম্পর্ক, অরূপের রাস, শঙ্কিত অভয়া ইত্যাদি।
খ. স্বার্থসর্বস্ব মানুষের নিষ্ঠুরতাভিত্তিক গল্প – এ ধারার গল্পঃ পয়োমুখম, পুরাতন ভৃত্য, মায়ের মৃত্যুর দিন, চার পয়সায় এক আনা ইত্যাদি।
গ. নিষ্ঠুর নিয়তি ও অতিপ্রাকৃত বিষয়ক গল্প – এ ধারার গল্পঃ দিবসের শেষে, হাড়, তৃষিত আত্মা, দৈব ধন ইত্যাদি।
ঘ. কৌতুকরস ও রোমান্টিক গল্প – এ ধারার গল্পঃ আঠার কলার একটি, কামাখ্যার কর্মদোষে ইত্যাদি।

একই গ্রন্থে তিনি জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যে আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যগুলোকেও তুলে ধরেছেন। জগদীশ গুপ্ত জীবনের বেদনা ও স্বভাবের অন্ধকার দিকটিকে প্রথম উদঘাটন করেছেন। তিনি আমাদের সমাজের প্রেক্ষিতে নিঃসঙ্গতাকে আবিষ্কার করেছেন। নির্মোহ ও নিরাবেগে মানুষের স্বভাব স্বার্থান্ধতা এবং মনের অশুচিতাকে বর্ণনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে নারী পুরুষের সম্পর্কে যৌনতার দিকটি নিয়ে তিনিই প্রথম আলোকপাত করেছেন, কোন অতীন্দ্রীয় অপার্থিব প্রেমের চিত্র আঁকেন নি। তাঁর পূর্বে এভাবে ভাবাটাই ছিল ভয়ের। জীবনের সমস্ত অবদমন মেনে নিয়ে মর্মে মরে যেত মানুষ, কিন্তু প্রকাশের সাহস ছিল না। জগদীশ গুপ্ত প্রথম খুলে দিলেন অবদমনের কুৎসিত দরজা। তাঁর সাহিত্যেই প্রথম দেখা যায়, নারী নির্যাতিতা বলেই সহজ সরল নয়, বরং জটিল মনস্তাত্ত্বিক আবর্তে সে দুর্বোধ্য। তাঁর গল্পে নিয়তি কোন কর্মফল হিসেবে নয়, বরং কাকতাল হিসেবেই এসেছে। কিন্তু তবু সে এমনই তীব্র যে, পাত্র-পাত্রীর পক্ষে তা দুর্লঙ্ঘ্য হয়েছে। জগদীশ গুপ্ত জীবনের রূঢ় বাস্তবতার চিত্র এঁকে গেছেন। পাপ-পূণ্য, শুভ-অশুভের আলাদা মূল্যায়ন করেন নি। জীবন যেমন, তাই লিখে গেছেন।

জগদীশ গুপ্তের প্রথম উপন্যাস *লঘু-গুরু* এখানে তিনি যে সমাজের বর্ণনা দিয়েছেন তা রবীন্দ্রনাথের কাছে বাস্তবিক মনে হয় নি। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটির সমালোচনা লিখেছিলেন পরিচয় পত্রিকায়। সেখানে তিনি উপন্যাসটির কিছু

মৌলিক ত্রুটি তুলে ধরলেও এক জায়গায় ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বসেছিলেন, যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্ভবত দ্বিতীয়বার করতে দেখা যায় নি।

> *এ-দেশে লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে কাটালুম,এই উপন্যাসের অবলম্বিত সমাজ তার পক্ষে সাত-সমুদ্র-পারের বিদেশ বললেই হয়। দূর থেকেও আমার চোখে পড়ে না। লেখক নিজেও হয়তো বা অনতিপরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে ও-জায়গায় উঁকি মেরে এসেছেন। আমার এই সন্দেহের কারণ হচ্ছে এই যে, লেখক আমাদের কাছে তাঁর বক্তব্য দাখিল করেছেন, কিন্তু, তার যথেষ্ট সমর্থন যোগাড় করতে পারেননি।*

উত্তরে জগদীশ গুপ্ত লিখেছিলেন,

> *'লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে এতকাল' আমাকে কাটাইতে হইয়াছে সেখানে 'স্বভাবসিদ্ধ ইতর' এবং 'কোমর বাঁধা শয়তান' নিশ্চয়ই আছে; এবং বোলপুরের টাউন-প্ল্যানিং-এর দোষে যাতায়াতের সময় উঁকি মারিতে হয় নাই, 'ও-জায়গা' আপনি চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু, তথাপি আমার আপত্তি এই যে, পুস্তকের পরিচয় দিতে বসিয়া লেখকের জীবন-কথা না তুলিলেই ভাল হইত, কারণ, উহা সমালোচকের 'অবশ্য-দায়িত্বের বাইরে' এবং তাহার 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' ছিল না।*

জগদীশ গুপ্তের গল্পে যৌনতা বড় চালিকার ভূমিকা পালন করেছে। মানুষের একটি শক্তিশালী প্রেষণা হিসেবেই যৌনতাকে গল্পে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি। যে যৌনতা জীবনে নেই, তেমন কোন অলীক গল্প শোনান নি। তাঁর গল্পের যৌনতা অশ্লীল নয়। যদি হত তবে তিনি সহজ জনপ্রিয়তা পেতে পারতেন। নিদেনপক্ষে নিজকালে বা একাংশ পাঠকের কাছে তাঁর কাটতি ভাল হতে পারত। কিন্তু তাঁর লেখা কোনকালেই তেমন পরিচিতি পায় নি। এমনকি, কোন বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণও বের হয় নি।

কল্লোল যুগ গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে লিখেছিলেন,

> *'অনেকের কাছেই তিনি অদেখা, হয়তোবা অনুপস্থিতও বটে।'*

তখন জগদীশ গুপ্ত ব্যক্ত করেন,

> *এই একটি শব্দ 'অনুপস্থিত' শব্দটি আমার সঙ্গে পাঠকের যোগরেখা চমৎকার নির্বিশেষভাবে দেখাইয়া দিয়াছে। একটি শব্দের দ্বারা এতটা সত্যের উদ্ঘাটন আমার পক্ষে ভয়াবহ হইলেও আনন্দপ্রদ। সরল ভাষায় কথাটার অর্থ এ-ই যে, অনেকেই আমার নাম শোনেন নাই।*

জগদীশ গুপ্ত সার্থক গল্পকার হলেও বিরলপঠিত। এর মূল কারণ, রচনার দুর্বোধ্যতা নয়, বরং তাঁর অভিনবত্ব ও দুষ্প্রাপ্যতা। নিজকালে জনপ্রিয় ছিলেন না বলে তাঁর অনেক লেখাই সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে। তাঁর রচনাসম্ভার অন্তত পাঠকের হাতে পৌঁছাতে পারলেও পাঠক আগ্রহ বোধ করতেন এটা নিশ্চিত। গল্পকার জগদীশ গুপ্ত মননশীল সাহিত্য সৃজন করে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন, এবার সেটাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করা এবং ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের। তাঁর মত লেখকদের বিস্মৃত হতে দেওয়াটা আমাদের জন্যই ক্ষতিকর হবে। আমরা কিভাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করছি, তার উপর নির্ভর করবে, আমাদের সাহিত্যের ভবিষ্যত।

তথ্যসূত্রঃ
বাংলাপিডিয়া